বোরো মৌসুমে ফলন ৪৫ লাখ টন বাড়ানোর উদ্যোগ

সিডরের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ধানবিজ্ঞানীরা মাঠে

তপন বাগচী

বন্যা ও সিডরের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধানের ফলনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ধান-বিজ্ঞানীরা মাঠে কৃষকের সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধি-দফতর চলতি বোরো মৌসুমেই ধানের ফলন ৪৫ লাখ টন বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে। কৃষকের প্রচলিত জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে এই ফলন বাড়ানো সম্ভব হতে পারে বলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ধারণা। ফলন বাড়ানোর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সঙ্গে ধানবিজ্ঞানীরাও যুক্ত হয়েছেন। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নিরসনের সাফল্যের পথ ধরে এবার সিডরের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিজ্ঞানীদের মাঠে কাজ করার এই যুগান্তকারী পদক্ষেপকে কৃষি সেক্টরে কর্মরত বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ ও গবেষকরা স্বাগত জানিয়েছেন।

কৃষকের কাছে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা

সিডরের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দেশে ইনব্রিড ও হাইব্রিড বোরো আবাদ এবং উৎপাদনের কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। কৃষি উপদেষ্টা ড. সি এস করিমের নির্দেশে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৬১ জন বিজ্ঞানী তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া অন্যসব জেলায় কাজ করবেন। তারা ধান উৎপাদনবিষয়ক গবেষণা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিবিষয়ক বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের কার্যক্রমকে সহায়তা দেবেন। তারা সরাসরি কৃষকদেরও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মোঃ নূর-ই-এলাহী জানান, পারস্পরিক মতবিনিময় ও সরেজমিন আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষি ও ধান চাষের অনেক অজানা সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে ধানবিজ্ঞানীরা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। গত ৩৭ বছরে এই প্রথম এ ধরনের গণমুখী কর্মসূচি নেওয়া হলো যা 'যুগান্তকারী' বললে অত্যুক্তি হবে না।

সিডরের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দেশে ইনব্রিড ও হাইব্রিড বোরো আবাদ এবং উৎপাদনের কর্মসূচি নিয়েছে সরকার

সম্প্রতি ব্রি'তে অনুষ্ঠিত পাঁচদিনের এক কর্মশালায় এসব উদ্যোগের কথা আলোচিত হয়। পাঁচদিনের এই পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি উপদেষ্টা ড. সিএস করিম, বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সচিব এম এ আজিজ, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. এম নুরুল আলম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম। বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্রি'র বর্তমান ডিজি ড. মোঃ নূর-ই-এলাহী ছাড়াও ড. তুলসী দাস, ড. এনআই ভূঁইয়া, ড. মোনতাজের রহমান, ড. দেবীনারায়ণ রুদ্রপাল, ডা. এম এ বাকী, এ ডব্লিউ জুলফিকার, ড. এম এ সালাম প্রমুখ বিজ্ঞানী।

পেছন ফিরে দেখা

১৯৬০ সালে ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (International Rice Research Institute) বা সংক্ষেপে 'ইরি' (IRRI) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও ধানের উচ্চফলনশীল বা উফশী জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। অনেক আগে থেকেই জাপানে উফশী ধানের চাষ হয়ে আসছে। চেন-চু-আই নামে ধানের একটি উফশী জাত চীন দেশে প্রচলিত ছিল। এই চেন-চু-আই জাতটি ষাটের দশকের শেষদিকে পূর্বাচী নামে বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়। 'চায়না ইরি' বা 'চীনা ইরি' নামেই এটি বেশি পরিচিত।

বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উফশী ধানের চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু ইরি থেকে উফশী ধান বের হওয়ার আগে যেসব ধানের চাষ হতো তার ফলন ছিল খুবই কম। বিজ্ঞানীরা এমন জাত উদ্ভাবন করলেন যাতে প্রচলিত সনাতন জাতের চেয়ে বেশি ফলন হয়। মাত্র তিন বছরের গবেষণায় ১৯৬৫ সালে এই ইনস্টিটিউট ইরি-৮ নামে একটি অতি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়। সারা বিশ্বে এই ধান পরে 'Miracle Rice' বা 'আশ্চর্য ধান' নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশে ইরি-৮-এর চাষ শুরু হয় ১৯৬৬ সালের বোরো মৌসুম থেকে। 'ইরি' থেকে ধানের উফশী জাত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়লে সারা বিশ্বে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খাদ্যসমস্যা সমাধানের একটা সুবর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ইরি ধান নয় ব্রি ধান

সকল ইরি ধানই উফশী ধান। কিন্তু সকল উফশী ধানই ইরি ধান নয়। 'ইরি'

থেকেই বের করা ধানের নাম ইরি ধান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বা প্রতিষ্ঠান থেকেই উফশী ধান উদ্ভাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ধানের জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তিনটি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU) উদ্ভাবিত ধানের নাম 'বাউ ধান', বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) উদ্ভাবিত ধানের নাম 'বিনা ধান' এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত ধানের নাম 'ব্রি ধান'।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এ পর্যন্ত ৪৭টি ধানের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এর একটি বাদে বাকিগুলো উফশী জাতের। কৃষকদের সুবিধার্থে এসব জাতের নতুন নাম দেয়া হয়েছে। জাতগুলো হচ্ছে- বিআর ১ (চান্দিনা), বিআর ২ (মালা), বিআর ৩ (বিপ্লব), বিআর ৪ (ব্রিশাইল), বিআর ৫ (দুলাভোগ), বিআর ৬ (নাম নেই), বিআর ৭ (ব্রিবালাম), বিআর ৮ (আশা), বিআর ৯ (সুফলা), বিআর ১০ (প্রগতি), বিআর ১১ (মুক্তা), বিআর ১২ (ময়না), বিআর ১৪ (গাজী), বিআর ১৫ (মোহিনী), বিআর ১৬ (শাহীবালাম), বিআর ১৭ (হাসি), বিআর ১৮ (শাহজালাল), বিআর ১৯ (মঙ্গল), বিআর ২০ (নিজামী), বিআর ২১ (নিয়ামত), বিআর ২২ (কিরণ), বিআর ২৩ (দিশারী), বিআর ২৪ (রহমত), বিআর ২৫ (নয়াপাজাম) এবং বিআর ২৬ (শ্রাবণী)। এরপর ২৭ নম্বর থেকে ব্রিধান২৭, ব্রিধান২৮, ব্রিধান৪৭ পর্যন্ত নামের জাত রয়েছে।

৩৬ বছরে চাষের জমি কমেছে কিন্তু ফলন বেড়েছে

সনাতন জাতের ধান আর মাঠে নেই

সারা দেশে প্রচলিত হাজার হাজার ধানের জাত আর নেই। এই ধানবৈচিত্র্য হারিয়ে যেতে বসেছে। আউশ মৌসুমের নোরই, বটেশ্বর, কালামাণিক, মাধবজটা, ভাটুরি, মেঘরাজ, কামরাঙ্গা, চন্দ্রহার প্রভৃতি বাহারি নামের ধান আর দেখা যায় না। আমন মৌসুমেও ছিল রায়দা, কাটারিভোগ, দাদখানি, বাঁশফুল, কালিজিরা, বাদশাভোগ, নাইজারশাইল, ঝিঙ্গাশাইল, পাটনাই, চিনিগুঁড়া, লতিশাইল প্রভৃতি অভিজাত নামের জাত। জাগলি, ময়নামতি, খাবরি, খৈয়া, চৈতা, ধলি, খেয়ালি, কালি, টেপি—এমনি আদুরে নাম ছিল বোরো মৌসুমের ধানের জাতের। পরিবেশবাদীরা দাবি করছেন যে, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এইসব ধানের জাত মাঠে রাখতে হবে। সনাতন জাতের ধানের বিচিত্র স্বাদ মানুষ ভুলতে বসেছে। বেশি ফলনের আশায় কৃষকরাও আর এইসব ধান ফলাতে আগ্রহী হয় না। বেশি ফলনের আশায় তারা চাষ করছে উফশী জাতের ধান। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া ধানের ব্যাপারে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জেনেটিক রিসোর্স ও বীজ বিভাগের বিজ্ঞানীরা জানান যে, ব্রি-র বীজ বিভাগে ৮ হাজার প্রজাতির ধানের জিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখানে আগে ১৫ বছর রাখা যেত, এখন ৫০ বছর রাখা যাবে। এখান থেকে যেকোনো জাতের ধানের বীজ মাঠে নিয়ে পুনরুৎপাদন সম্ভব।

মঙ্গা নিরসনে ব্রিধান-৩৩ : পেছনের রহস্য

এবার উত্তরবঙ্গে মঙ্গা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ব্রিধান-৩৩ জাতটি। এটি শ্রীলঙ্কা থেকে প্রবর্তনকৃত একটি কৌলিক সারি। বাংলাদেশের মাটি ও পরিবেশে আরো অনেক জাত ও কৌলিক সারির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই জাতটির উপযোগিতা মেনে নেয়া হয়েছে। ব্রিধান-৩৩ এর উচ্চতা ৪৩ ইঞ্চি, জীবনকাল ১১৮ দিন, চাল খাটো ও মোটা, হেক্টরপ্রতি ফলন ৫ টনের মতো এবং পাতাপোড়া রোগ ও সাদাপিঠ গাছফড়িং পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে।

বিশিষ্ট ধানবিজ্ঞানী ড. ফরহাদ জামিল আমাদের দেশে এ ধরনের একটি আগাম রোপা আমন ধান জাতের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন আজ থেকে ১০ বছর আগেই। এই মৌসুমের অন্যান্য ধান পাকে সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে। কিন্তু ব্রিধান-৩৩ যথাসময়ে লাগানো হলে অর্থাৎ আষাঢ়ের মাঝামাঝি বীজ বপন ও শ্রাবণের মাঝামাঝি চারা রোপণ করা হলে কার্তিকের মাঝামাঝি গিয়ে ধান পেকে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। [দৈনিক সংবাদ, ১২/০৬/৯৮] স্বাভাবিক সময়ের ৩/৪ সপ্তাহ আগে পাকে এমন একটি ধানের জাত চাষের কয়েকটি সুবিধার কথাও তিনি বলেছিলেন। যেমন রোপা আমন মৌসুমের শেষ দিকে ধানক্ষেতে প্রায়ই পানির অভাব দেখা দেয়। আগাম জাত বলে ব্রিধান-৩৩-এর ক্ষেত্রে তেমনটি হবার আশঙ্কা কম। রোপা আমন ধান পাকার স্বাভাবিক সময়ের আগে অর্থাৎ কার্তিক মাসে দেশে ধান-চালের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এটি আগে পাকে বলে তখন সে ধরনের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে। অগ্রিম কাটার পরে সেই জমিতে সময়মতো গম, ডাল, তেলবীজ ও অন্যান্য রবি ফসলের চাষাবাদ করা সহজতর হবে। আগাম জাত হলেও উচ্চফলনশীল ধান বিধায় এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৩.৫—৪.৯ টন পর্যন্ত হতে পারে।

এই সুবিধা বিবেচনা করেই দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্রিধান-৩৩-এর চাষ করে এবারের মঙ্গা নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে।

অতি উচ্চফলনশীল ধানের সন্ধানে

ধানের উচ্চ ফলনশীল জাত বিশ্বের ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে ধানের উৎপাদন। কিন্তু জনসংখ্যা অব্যাহত বৃদ্ধির কারণে ধানের উৎপাদনবৃদ্ধির সুফল টের পাওয়া যায় না। ব্রি-র প্রতিষ্ঠার সময়ে ১৯৭০-৭১ সালে এ দেশে চালের মোট উৎপাদন ছিল ১০.৯৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৫-২০০৬ সালে চালের উৎপাদন হয়েছে ২৯.৭৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এই ৩৬ বছরে চাষের জমি কমেছে কিন্তু ফলন বেড়েছে। কর্তৃপক্ষ দাবি করে, এই কৃতিত্ব ব্রি-র। কিন্তু এর পরেও দেশের খাদ্যঘাটতি পূরণ করা যায়নি। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া এবং নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও বসতি

সম্প্রসারণের ফলে চাষের জমি কমে যাওয়াই খাদ্যঘাটতি অব্যাহত থাকার কারণ বলে ব্রি-র বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

তবে খাদ্যঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে 'সুপার রাইস' উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। গোল্ডেন রাইস বা ভিটামিন রাইস উদ্ভাবন করে দেশের বিদ্যমান পুষ্টিচাহিদা পূরণ করার চেষ্টাও করে চলেছেন ব্রি-র বিজ্ঞানীরা।

প্রসঙ্গ হাইব্রিড ধান

হাইব্রিড ধানও এক ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধান। বন্ধ্যাকরণের ফলে এর ফলন বাড়ে, কিন্তু বীজ থেকে নতুন ধান উৎপন্ন হয় না। বীজ রাখতে না পারার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রান্তিক কৃষক। হাইব্রিড প্রযুক্তির বিরুদ্ধে তাই পরিবেশবাদীরা সোচ্চার। কিন্তু বাণিজ্যিক কারণে বহুজাতিক কোম্পানি এই বীজের ব্যবসা করে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে আনা হাইব্রিড বীজ বিক্রি করে মুনাফা লুটে নিতে আমাদের দেশের চাষের উপযোগিতা যাচাই না করেই বিভিন্ন কোম্পানি চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে কৃষকদের আকর্ষণ করছে। এই বীজ রোপণ থেকে কর্তন পর্যন্ত বেশ কিছু প্রযুক্তিগত জ্ঞানেরও দরকার হয়। তা যথাযথভাবে মানা না হলে প্রত্যাশিত ফলনও পাওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থা বিবেচনা করে ব্রি হাইব্রিড ধান-১ উদ্ভাবন করেছে। ব্রি হাইব্রিড আবাদে প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি বীজ ব্যবহৃত হয়, যা প্রচলিত ধানের চেয়ে ১০ কেজি কম। ব্রি ধান-২৯-এর চেয়ে এই ধানের ফলন ১ টন বেশি, যা হেক্টরপ্রতি ৮.৫ টন। ব্রি'র বিজ্ঞানীরা হাইব্রিড চারা রোপণের সময়সীমা ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি সুপারিশ করেছেন। কিন্তু ১৫ জানুয়ারির পরেও বিভিন্ন কোম্পানি বীজ বিক্রির বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এতে প্রত্যাশিত ফলন হবে না বলে ব্রি'র বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছেন। এ ব্যাপারে কৃষকদের সচেতন করার দায়িত্ব পালন করতে পারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। ব্রি'র সুপারিশ ও প্রযুক্তি পরামর্শ প্রান্তিক চাষীদের কাছে সময়মতো পৌঁছতে পারলে ধানের ফলন বাড়ত বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ধান গবেষণার সীমাবদ্ধতা

ব্রি'র অনেক সাফল্যের মধ্যেও কৃষকের চাহিদামতো ধানের জাত উদ্ভাবনের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা এখনও রয়ে গেছে। গভীর পানিতে চাষের উপযোগী উফশী জাতের ধান এখনও উদ্ভাবন করা যায়নি। পাহাড়ি এলাকার জন্য উফশী জাতের ধানের দাবিও পূরণ করতে পারেনি। সেচবিহীন চাষযোগ্য জাত এবং বালাই প্রতিরোধী টেকসই ধানের জাত উদ্ভাবনও কৃষকের প্রাণের দাবি।

ধান গবেষণার আবিষ্কার

- একটি হাইব্রিডসহ ৪৭টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এদের ফলন সনাতন জাতের চেয়ে ২-৩ গুণ বেশি।
- মাটি, পানি, সার ব্যবস্থাপনা ও ধান চাষের ৫০টির বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- ধানভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন ৩১টি।
- কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ২২টি।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া ৮ হাজার প্রজাতির ধানের জার্মপ্লাজম জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ।
- ১৯৭০-৭১ সালে চালের উৎপাদন ১০.৯৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ২০০৫-০৬ সালে বেড়ে হয়েছে ২৯.৭৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।
- ব্রি উদ্ভাবিত ২০টি জাতের ধান ১৯টি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. শহীদুল ইসলাম মনে করেন, প্রত্যেক ইকোসিস্টেমে গ্রহণযোগ্য ধান চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন শস্যের ক্রমবিন্যাস (সীমজাতীয়, তেল ফসল, সবজি ইত্যাদি) নির্ধারণ করা, মাটির স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য সহজ চাষপদ্ধতি অনুসরণ করা এবং ধানভিত্তিক চাষপদ্ধতির জন্য উপযোগী মডেল উদ্ভাবন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ব্রি'র প্রযুক্তি সম্পাদক মনোরঞ্জন মণ্ডল মনোজ জানান, ধানবিজ্ঞানীরা কর্মমুখী গবেষণার প্রতি জোর দেয়ায় এবার প্রত্যাশিত সাফল্য আসতে পারে।

দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে উফশী ধান এখন চাষ করা হচ্ছে। এ থেকে দেশে মোট উৎপাদিত ধানের ৮৭ ভাগ পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরেও প্রতি বছর খাদ্যঘাটতি দেখা যাচ্ছে। উফশী ধানের প্রসার না হলে বর্তমানে চালের উৎপাদন হবে মাত্র ১ কোটি ৫০ লাখ টন। প্রতি বছর যেখানে চাষের জমি কমছে এক শতাংশ হারে, সেখানে ২ কোটি ২৯ লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করেও চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। প্রতি বছর ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে চাল আমদানি করতে হচ্ছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেবল বিজ্ঞানী নয়, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই।